বিপ্লব, বিদ্রোহ, আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ইতিহাসের অংশ। কখনো তা বিধৃত হয় অথবা হয় না। নির্ভর করে সমাজে নারী কতটা সচেতন ও সক্রিয় এবং পুরুষ কতটা সংবেদনশীল তার প্রতি। এ সূত্রেই কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মানেই সে দেশের নারীর ইতিহাস। জাতিগত ইতিহাসের সূচনা দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে ঘটলেও যুদ্ধের বিজয়ের সূত্রে সূচনা হয় জাতীয় ইতিহাসের সূত্র।
লিখেছেন শামীম আখতার

বিজয় দিবস এবং নারী জীবনের ৩৬ বছর

'আমার কেবল হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে সাধ হয়। ইচ্ছে করে সাগরের ঢেউয়ে সওয়ার হয়ে পুব সাগরে হাঙর শিকার করি। ইচ্ছে করে সীমান্ত ঘষে-মেজে মিটিয়ে দিই। টেনে তুলি ডুবন্ত মানুষকে। কিন্তু সব ইচ্ছে মিলিয়ে যায় কেন? সেই তো নিয়মের দাস হয়ে মাথা নিচু করে থাকা, নতজানু হয়ে ঘাড় গুঁজে ক্রীতদাসের মতো অন্যের ইচ্ছে পালন। কেন সংসারের শত তুচ্ছের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়?'

উক্তিটি ভিয়েতনামের এক চাষী বউয়ের যিনি ২৪৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তার নাম ত্রিউ থি ত্রিনহ।

বিপ্লব, বিদ্রোহ, আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ইতিহাসের অংশ। কখনো তা বিধৃত হয় অথবা হয় না। নির্ভর করে সমাজে নারী কতটা সচেতন ও সক্রিয় এবং পুরুষ কতটা সংবেদনশীল তার প্রতি। এ সূত্রেই কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মানেই সে দেশের নারীর ইতিহাস। জাতিগত ইতিহাসের সূচনা দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে ঘটলেও যুদ্ধের বিজয়ের সূত্রে সূচনা হয় জাতীয় ইতিহাসের সূত্র। বাংলাদেশের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর তেমনি করেই সূচনা হয় এর অন্তর্গত নারীদের জাতীয় জীবন। সেই জাতীয় জীবনের নানান বর্ণের অভিজ্ঞতা যে কোনো উন্নয়ন সূচকের চাইতে বেশি কথা বলে। তেমনি কিছু ভিন্ন আঙ্গিকের হিসাব এখানে বিধৃত হলো।

বিজয়ের পর প্রথম যে পত্রিকা হাতে আসে তা হচ্ছে দৈনিক পাকিস্তান কাটা, বাংলা। সেই প্রথম বুঝি একটি পত্রিকাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অগণিতবার দেখা। একই হরফ, একই মুদ্রণ, পত্রিকার খসখসে টেক্সচার, ছাপার গন্ধ; অথচ কি ভিন্ন এক অনুভূতি সঞ্চারিত হয় পত্রিকা হাতে নিয়ে। এ রকম এক একটি পত্রিকা, বছরের পর বছর ৩৬ বছরের খতিয়ান হয়ে আছে, যা বাংলাদেশের নারী বাস্তবতার কথা বলে।

বাংলাদেশের মুক্তির পরের বছরটির অর্থাৎ ১৯৭২-

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারীরা এখন গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, অর্থনীতিবিদ

স্বাধীনতার পর পেয়েছিলাম এক বিধ্বস্ত অর্থনীতি। স্বল্পতম সময়ে আমরা তা পুনর্নির্মাণ করেছিলাম। ১৯৭৫ সালে এসে আমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। স্বাধীনতার আগে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের খাদ্য জোগান দেয়া ছিল কষ্টকর। ২০০০ সালের মধ্যে আমরা ১৫ কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিলাম। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও উৎপাদনশীলতার মূল নায়ক ছিল দেশের কৃষক সমাজ।

পাট রফতানিনির্ভর অর্থনীতি স্বাধীনতার পর ঘুরে দাঁড়াল। বাঙালিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে শ্রম বিক্রয় করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাতে শুরু করলেন। স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা সেভাবে দেখা যেত না; কিন্তু এখন গার্মেন্টসহ বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তারা গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। ব্যবসায়িক চেম্বারগুলোতেও নারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। অর্থনীতিতে এটি একটি আশাব্যঞ্জক দিক। পোশাকশিল্পে মুনশিয়ানার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উৎপাদনশীল শিল্পেও আমাদের উদ্যোক্তারা বিস্তর সাফল্য দেখিয়েছেন। গড়ে বছরে পাঁচ ভাগ দেশজ আয় বৃদ্ধি এবং পাঁচ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এক শক্তিশালী অর্থনীতির নির্দেশক। এসবই স্বাধীনতার ফসল।

এর মার্চ মাস থেকেই পত্রিকার পাতায় শোকাহত পরিবারের নিহতজনের ছবি। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে পরিবারের আকুতি। তখনো নিত্যনতুন গণকবর, বধ্যভূমি, নর-নারীর কঙ্কাল উদ্ঘাটিত হচ্ছে। প্রতিদিন শহীদের উদ্দেশে কত কত শ্রদ্ধাঞ্জলি পাসপোর্ট ছবিতে শোভিত, যা অগণিত মানুষের অন্তর্ধানের সাক্ষ্যবহ। প্রতিদিনের পত্রিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বহু নারীর সন্তানহারা হওয়া বা আকস্মিক বৈধব্যের কথা। তখনো খবর সংগ্রহের ব্যাপ্তি সীমিত। তবুও যে খবর এসেছে, তাতেই শিউরে উঠেছি। এত মৃত্যু সারা দেশজুড়ে! তখনো গণধর্ষণের ঘটনা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ। উচ্চারণ মাত্রই যেন বা নারীর সম্মানহানি ঘটবে পুনর্বার। সুতরাং আজকের হিসাবে ৩০ হাজার মা, স্ত্রী, কন্যা স্বজন হারিয়েছিলেন। ২ লাখ নারীর জীবনে রেখাপাত করে ধর্ষণের অভিঘাত। বাকি চার কোটি ছোট-বড় নারীর মানসে মুক্তিযুদ্ধ আতঙ্ক এবং বেদনার অধ্যায় হয়ে জেগে থাকে, যা ৩৬ বছরেও ম্লান হবার নয়।

স্বদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন

বিজ্ঞজনরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন প্রায়ই। নতুন প্রজন্মের কাছে যা কতক শব্দ মাত্র। এর তাৎপর্য ব্যাখা করতে বললেও অনেকে কোথা থেকে ব্যাখার সূচনা করবেন খুঁজে পান না। বিষয় ভেঙে বুঝতে চাইলে এর সহজ হিসাব আজকের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দিকে চাইলেই অনুমেয়। এ ধরনের রক্ষণশীল, অনুদার, শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ এবং কড়া সামরিক নিয়ম অধ্যুষিত পাকিস্তান ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছে। কেউ যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই তা ধর্ম বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহের হিসেবে দেখা হয়েছে। পাকিস্তানি এ অপকৌশলের বিপরীতে বাংলাদেশের মানুষ অবস্থান নেয়। নানা অজুহাতে শাসন এবং শোষণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেই মুক্তিযুদ্ধ অবধি গড়ানো। সুতরাং বিজয়ের পর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে ইতিহাসের অভিঘাত এবং বঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখতে সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানের কোথাও পাকিস্তানের কোনো অপছায়া যেন না থাকে, সে নিয়ে ছিল সতর্ক দৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে মুক্তির শর্তগুলোকে সমুন্নত রাখার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বোঝায়। মুক্ত মানুষের প্রথম শর্তই হচ্ছে অন্যের মুক্তির পরিসর সাগ্রহে রক্ষা করা। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীগুলো একে একে মুক্তির শর্তগুলোকে আঘাত করে। আগের শর্তগুলো পুনর্বহাল করতেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

নারীর জীবনে ৩৬ বছর

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেকেই স্বপ্ন দেখতেন যুদ্ধের ধ্বংসপ্রাপ্ত পরবর্তী স্বদেশ গড়ার কাজে কাঁধ বাড়িয়ে দেবেন। এত যে বড় একটা যুদ্ধ

সাংবাদিকতায় নারীদের সংখ্যা এখনো অনেক কম

সিতারা মূসা, সাংবাদিক

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে নারীর অবদান অনেক। এখন মেয়েরা রিপোর্টার ও এডিটর হচ্ছেন। আমাদের সময় এমনটি ছিল না। সে সময় মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেয়ে সাংবাদিকতায় কাজ করতেন। স্বাধীনতার পর একঝাঁক তরুণী সাংবাদিকতায় আসেন। বেশির ভাগই তখন দৈনিক সংবাদে কাজ শুরু করেন। তখন সবাই ডেস্কে কাজ করতেন। রিপোর্টিংয়ে ছিলেন বেবি মওদুদ। তখনকার নাইট ডিউটি ছিল রাত ২-৩টা পর্যন্ত। সেই সময় মেয়েরা রাত জেগে কাজ করেছেন। আশির দশকেও কিছু মেয়ে সাংবাদিকতায় আসেন। নারী সাংবাদিকতায় জোয়ার এসেছে নব্বইয়ের দশকের পর। এ সময় বেশ কিছু নতুন সংবাদপত্র বাজারে আসে। ১৯৯১ সালে প্রেস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট বাতিল হলে সংবাদপত্র বের হয় বেশি সংখ্যায়। নারীরাও কাজের সুযোগ পান। এখন ফিচার, নারী, বিনোদন, খেলা, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন পাতা বের হচ্ছে। সেসব জায়গায় মেয়েরা কাজ করছেন। নব্বইয়ের শেষের দিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া নারী সাংবাদিকদের রিপোর্টিংয়ে দরজা খুলে দেয়। এখানে নারী সাংবাদিকরা রিপোর্টিংয়ে কাজ করছেন। এখনো তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারেননি। দৈনিক সংবাদ ও প্রথম আলোয় ফিচার এডিটর হিসেবে সুমনা শারমিন ও আবিদা নাসরীন কলি কাজ করছেন। তারপরও নারীরা সাংবাদিকতায় অনেক পিছিয়ে আছেন। সাংবাদিকতায় নারীর অর্জন খুব বেশি না হলেও কম নয়। দেশ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারী সাংবাদিকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

তরুণের চোখে স্বপ্নের বাংলাদেশ

রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি

রিপোর্টার, ইত্তেফাক

যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল তা বড় হয়ে জেনেছি। মুক্তিযুদ্ধ নিজের চোখে দেখিনি। আমার চাচা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাদের যে চেতনা ছিল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন করা। তাদের সে আশা পূরণ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের মূল ব্যর্থতা বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। প্রকৃত নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন মানুষকে নেতা হওয়া উচিত। দেশে মেয়েদের অনেক উন্নতি হয়েছে; তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

তাসনিনা ইয়াসমিন

ছাত্রী, বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ

আমি তো মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, গল্প শুনেছি। এটি জানি, যুদ্ধে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। আমাদের অনেক আত্মীয় মারা গেছেন। আমাদের অর্থ-সম্পদ লুট হয়েছে। এখনো বাংলাদেশে লুট হয় অর্থ, নারীর সম্মান। এসব দেখে খুব খারাপ, লাগে কষ্ট পাই। তখন মনে হয়, আমি কি এই স্বাধীন দেশের নাগরিক? আমাদের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি না করতে পারলে এ স্বাধীনতার কোনো মূল্য থাকবে না।

আশিকুর রহমান সুখন

ছাত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, নর্দান ইউনির্ভাসিটি

এখন আমাদের দেশের যে অবস্থা দেখছি তাতে আমার মনে হয়, আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা ছিল তা বর্জন হয়েছে। আমাদের দেশ আজ অন্য দেশের কাছে আটকা পড়ে আছে। যে কোনো দরকারে বাইরের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। এটি স্বাধীন দেশের অবস্থা হতে পারে না। বর্তমানে যেটুকুও আছি তা যদি বদলাতে না পারি তবে যে স্বাধীনতাটুকু আছে সেটুকুও হারাবো। এ স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে, দেশ এগিয়ে নিতে এখনই সচেতন হতে হবে।

নারীদের লেখা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের অবদান উঠে আসে

রিজিয়া রহমান, কথাসাহিত্যিক

১৯৭১ সাল অর্থাৎ মহান মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশের সাহিত্যে নারীদের লেখালেখি অনেক বেড়েছে। ছোটগল্প, উপন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সাহিত্য, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্যেও কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য। কবিতায়ও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে এ সময়ের মধ্যে পেয়েছি। ষাটের দশকেও বেশ কয়েকজন ভালো মানের কবি ছিলেন। তারাই পরে অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছেন। আশির দশকেও বেশ কয়েকজন ভালো নারী সাহিত্যিক সাহিত্য জগতে আগমন করেছেন। যারাই লেখালেখি করেছেন, নিজস্ব ধারা তৈরি করেছেন তারা ভালো করেছেন। সম্প্রতি তরুণ প্রজন্মের যেসব নারী এসেছেন এর মধ্যে নাসরীন জাহান নিজস্ব স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। শাহীন আক্তার ও জাহানারা নূরীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা যথেষ্ট। তাদের রচনার মধ্যে ভবিষ্যতের বড় সাহিত্যিকের প্রতিশ্রুতি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের সাহিত্যে বেশ কয়েকজন তার নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে নারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নারীদের সাহিত্যে অবদান প্রচুর। মহিলাদের লেখায় প্রচুর পরিমাণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লেখা আছে। যা দেখেছি, যা ছিলাম সেটিই চলে আসে লেখার মধ্যে। এটি তো অস্বীকার করা বা সরিয়ে নেয়ার কোনো বিষয় নয়। যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের মনের মধ্যে এ মুক্তিযুদ্ধ ভয়ঙ্কর একটি জায়গা নিয়ে আছে। জাতীয় জীবনের এমন অবিস্মরণীয় ঘটনা ও গৌরবোজ্জ্বল অর্জনকে আমাদের জীবন থেকে আলাদাভাবে দেখার কোনো উপায় নেই। সুতরাং একজন সাহিত্যিকও একে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তার যে কোনো রচনায় মুক্তিযুদ্ধ এসেই যায়। তবে বলতে হয়, নারী রচিত বেশ কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ও ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং স্বাধীনতার পর সাহিত্যে নারীদের অবদান অবহেলা করার মতো ব্যাপার মোটেই নয়।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীরা পিছিয়ে আছেন

শিরিন আকতার, নারী ও রাজনৈতিক নেত্রী

৩৬ বছর পর স্বাধীনতার এ সময় নারীর সমঅধিকার এবং মর্যাদার প্রশ্ন যদি আমরা বলি তাহলে বলব, অনেকটা পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি। এখন সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকারের বিষয়টি আলোচিত ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। উন্নয়নের প্রশ্নে নারীর ক্ষমতায়ন, তার মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে বিবেচনায় আনা হয়। তারপরও বলতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীরা পিছিয়ে আছেন। এখনো সমঅধিকার এবং ক্ষমতার অংশীদারিত্ব প্রশ্নে তাদের অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেননি। সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন বা সাধারণ আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে; যদিও দু'জন নারী দীর্ঘদিন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে দেশ শাসন করেছেন। প্রশাসনের উঁচু স্তরেও নারীদের সংখ্যা খুবই সীমিত। এছাড়া ধর্মীয় অনুশাসন, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িক শক্তি নারীর জন্য বিশাল একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত একাত্তরে নারীদের ওপর অত্যাচারকারী, যারা যুদ্ধপরাধী তাদের বিচার বাংলার মাটিতে করা যায়নি। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রসহ সর্বক্ষেত্রে নির্যাতনের চিত্র কমানো যায়নি। তারপরও নারীরা সোচ্চার, সংগঠিত, নারী অধিকারের বিষয়ে সচেতন। বিশেষ করে শ্রমিক নারী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত নারী তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার হার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়লেও উচ্চ স্তরে নারীর শিক্ষার সুযোগ এখনো সীমিত। খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নারীদের যতটা দক্ষতা রয়েছে সে অনুযায়ী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সীমিত। পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক নারীকে এখনো তার মেধা যথাযথ কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সামাজিক মূল্যবোধগুলো বাস্তবে নারীকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেয়ে পিছিয়ে দেয়। এরপরও বলব, বেগমান পথ ধরে যে নারীর সংগ্রাম তা ১৯৭১ থেকে অনেক দূর এগিয়েছে; তবে সমঅধিকারের জন্য আমাদের লড়তে হবে অনেক দূর।

ঘটে গেল, এত মৃত্যু, এত ক্ষত, এর থেকে মুক্তির জন্য প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু করণীয়। কিন্তু সে সুযোগ সেভাবে আর আসেনি। রাজনৈতিক নানান মতাদর্শ, মতবাদ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে কখনো স্থির হতে দেয়নি। সবাই যখন স্ব স্ব ইচ্ছের আদলে রাষ্ট্র গড়তে চায়, সেই নানা মত, নানা পথের বিভাজন এবং ফাঁকগুলোকে বড় করে তোলে স্বার্থান্বেষী মহল। তারা কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, টুকরো করে। তারই শিকার আজকে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ। প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজের অবহেলিত অংশ অথবা গৌণ গুরুত্বের অবস্থান এবং অংশ হিসেবে নারীর অবস্থা কি রকম।

অর্জন

● মুক্তিযুদ্ধের সূত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংবিধান, যেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত।

● মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান নারীর জন্য পরিসর সৃষ্টি করে।

সম্ভাবনা

৩৬ বছরের পরিধিতে নারী বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের পোশাকশিল্প মানেই নারী এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জন। সুতরাং এটা খুব স্পষ্ট যে, নারী উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীর অংশ, তাকে কাজ এবং সুযোগ দিলে সে করে দেখাতে পারে।

সমস্যা

সমাজের প্রতিটি স্তরের নারী কম বেশি রাষ্ট্র এবং সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত। একটি মেয়ে যতই বড় হয়, সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে সে ঝরে যেতে থাকে। রাষ্ট্র এবং সমাজ নারীর জন্য বিকাশের, সম্ভাবনাকে পর্যাপ্ত ব্যবহারের জন্য এখনো কার্যকর হয়ে ওঠেনি। তার সবচাইতে জাজ্বল্যমান সত্য– শিক্ষা, প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বড়সড় উপস্থিতি এবং পাশাপাশি উচ্চতর অবস্থানে নারীর সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে যাওয়া।

● এর পেছনে বড় কারণ নারীর ভূমিকা এবং পারিবারিক দায়িত্ব।

● আজও বড়সংখ্যক নারী কম বেশি সহিংসতার শিকার। নারীর বিকাশের পথে সবচাইতে বড় অন্তরায় আজকের পরিবার।

● নারীর ওপর সহিংসতা হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। নানাভাবে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে আক্রান্ত।

● পাশাপাশি স্বাস্থ্য প্রশ্নে চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। প্রথমত. নারীর স্বাস্থ্য মূলত প্রজনন

তরুণের চোখে স্বপ্নের বাংলাদেশ

নাহীদ আক্তার

গৃহিণী, আজিমপুর, ঢাকা

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, গল্প শুনেছি। আজ এত বছর পর মনে হয় আমরা নিজেদের কাছেই পরাধীন। আমরা আজও আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাইনি। এখনো আমাদের প্রাপ্য স্বাধীনতা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। আজও আমাদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। না হলে এ স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পাবো না। এ হবে কাগুজে স্বাধীনতা।

মোহাম্মদ রাজু

গাড়িচালক, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা নতুন প্রজন্ম অনেক কিছুই জানি না। যত আলোচনা সব কিছু বিজয় দিবস আর স্বাধীনতা দিবসে হয়। সব এদিনেই আটকে গেছে। সব সময় আলোচনা হয় না। এসব কারণে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে না। এটি আসলে জানানো দরকার। এই দেশটি গরিব দেশ। স্বাধীনতার পর এ দেশের উন্নয়ন যেভাবে হওয়া দরকার তা হচ্ছে না। উন্নয়নের জন্য এখন থেকেই কাজ করা দরকার।

পার্বতী শীল

এসএসসি পরীক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক এটির প্রমাণ বাস্তবে চাই। এখনো আমাদের দেশের সকল নাগরিক তার মৌলিক চাহিদা পূর্ণভাবে পাচ্ছে না। এটা যেন পায় তা চাই। নারীদের সব অধিকারের আন্দোলন নিয়ে বাঁচতে চাই। প্রতিবন্ধী নারী যেন সর্বক্ষেত্রে সুযোগ পায় তা চাই। একজন নারী যেন পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে পারে– হোক সে পরিপূর্ণ নারী কিংবা প্রতিবন্ধী। সেই পূর্ণতা চাই। এখনো এ দেশে পরিপূর্ণতার যথেষ্ট অভাব।

স্বাস্থ্যকে বোঝায়। গ্রাম ও শহরে যদিও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দেখা পাওয়া যায়, তার সেবার পরিধি এবং সুযোগ সীমিত। গ্রামের মেয়েদের নানা অনুশাসনের মধ্যে চলতে হয়। তাদের পক্ষে মরণাপন্ন অবস্থায় কেবল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দেখার সুযোগ মেলে।

● সম্পদের বড় অংশ এখনো পুরুষের হাতেই কুক্ষিগত। এই ক্ষেত্রে কিছু টুকটাক দাবির মুখে আংশিক বদল ঘটেছে। তবে কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে নিজে ব্যবসা করছেন, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন।

● যদি মিডিয়ার দিকে তাকাই, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপক বদল ঘটছে। কিন্তু অনুষ্ঠান প্রযোজক বা উচ্চ পদে এখনো ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে অনুষ্ঠানের ধারা, নারীর রূপায়ণ, নারীর উপস্থিতি এবং নির্দেশনা নিয়ে। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি অন্তত নারীর পরিসর তৈরির বিবেচনায়। হয়তো পর্দায় উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ বেড়েছে; কিন্তু নারীর পুরনো সামাজিক ভূমিকাগত উপস্থাপনার এবং রূপায়ণে বদল ঘটেনি।

● আরো একটি দিক না বললেই নয়– এ দেশের শহর অথবা গ্রাম একেবারেই নারীবান্ধব নয়। কি পথ চলা, কি কর্মক্ষেত্রে– সবখানেই প্রান্তিক অবস্থান। জায়গা বা পরিসর কম। অফিসের পর আড্ডা দেবার সুযোগ যেমন নেই, বসবার বা জিরিয়ে নেয়ার জায়গাও নেই।

একা মেয়ের জন্য নিরাপত্তা?

একা মেয়েদের কথা কারো মাথায় নেই। তাদের জন্য থাকার জায়গা রেখে কেউ বাসস্থান তৈরি করে না। কেউ যদি একাকী, নিজের মতো থাকতে চায়, তার সমস্যা তখন সীমাহীন। চলাচল, যাতায়াতও পুরুষের নজরদারির মধ্যে।

সংগঠিত হবার অধিকার

সবচাইতে বড় যে সংকট, সে হচ্ছে চেতনাগত অস্পষ্টতা এবং সংগঠিত হতে না পারা। এক সময় বিভিন্ন নারী ইস্যুকেন্দ্রিক সংগঠন ছিল, প্রয়াস ছিল। বিভিন্ন ইস্যুতেও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ দেখা যেত। ৩০ বছরের বাংলাদেশ ভালো অর্থেই সংগঠিত হতে ভুলে গেছে। অথচ সেটা তার গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রধান শর্ত।

অভিনয় করেও নারীরা আজ স্বাবলম্বী হচ্ছে

শর্মিলী আহমেদ, অভিনেত্রী

স্বাধীনতার পর আমাদের অভিনয়ের ক্ষেত্র ছিল কম। তাই আমাদের কাজের ক্ষেত্রও কম ছিল। সব মিলিয়ে তখন নারী-পুরুষ অভিনয় শিল্পীর সংখ্যা কম ছিল। ধীরে ধীরে আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আগে অভিনয়ের ক্ষেত্র ছিল মাত্র তিনটি– মঞ্চ, রেডিও এবং চলচ্চিত্র। এখনো এ তিনটি ক্ষেত্র আছে, সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে টিভি চ্যানেল। এখন অনেক টিভি চ্যানেল। সেখানে নাটকের প্রাধান্য বেড়েছে। এসব কারণে প্রচুর কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। শিল্পীরা কাজ করছেন, সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু নারী অভিনয় শিল্পী নন, পুরুষরাও কাজ করছেন– সঙ্গে অনেক মেয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীও এখানে কাজ করছেন। ফলে তাদের প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। মেয়েদের এ কাজে আগ্রহ অনেক বেড়েছে। দাপটের সঙ্গে মেয়েরা আজ অভিনয় করছেন। অনেক শিক্ষিত, দক্ষ, পরিশ্রমী অভিনয় শিল্পী আমরা পাচ্ছি। উন্নত প্রযুক্তি আমাদের সব দিক থেকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন দেশের চ্যানেলের অভিনয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিসহ বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের অভিনয় আমরা দেখছি। তাদের দেখেও আমরা শিখছি। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। তাদের চেয়ে ভালো করার চেষ্টা করছি। এখন অভিনয়ের ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ায় অনেক মেয়েই একে পেশা হিসেবে নিচ্ছেন। এটি একটা বিশাল ব্যাপার। আগেই এটি সম্ভব ছিল না। এখন অভিনয় করেও নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অভিনয় ইন্ডাস্ট্রিতে নারীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের স্থান দখল করেছেন। এ দেশের অভিনয় জগতে নারীদের অবদান কম নয়। তারা নিজ নিজ যোগ্যতায় তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। ধীরে ধীরে এ ইন্ডাস্ট্রি আরো বিকশিত হচ্ছে। শুধু মেয়েরা নন, বাবা-মায়েরাও সন্তানকে এ জগতে প্রবেশে আগ্রহ দেখাচ্ছেন যা আগে বলতে গেলে ছিলই না। এখন আমরা নতুন অভিনয় শিল্পী পাচ্ছি। নারীরা আজ কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই। অভিনয়েও পিছিয়ে নেই। ভবিষ্যতে এ শিল্পীরাও আরো ভালো করবে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু নাটক নয়, তরুণ ছেলেমেয়েরা এখন চলচ্চিত্র তৈরিতেও আগ্রহী হচ্ছে। এ পর্যন্ত যে কয়টা চলচ্চিত্র হয়েছে সেগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো। এখানে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যেমন অভিনয় করছে, কলাকুশলীরাও তেমন সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে শুধু অভিনয়ে নয়, সব ক্ষেত্রেই আমাদের মেয়েদের পাচ্ছি। তারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ভবিষ্যতে আরো ভালো কাজ করবে আমাদের দেশের মেয়েরা অভিনয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমি ভীষণ আশাবাদী আমাদের মেয়েদের নিয়ে।

শেষ যেদিকটি না বললেই নয়, সে হচ্ছে নারীর নিজেকে তৈরি করার স্পৃহা, যা তার সাজসজ্জার বেলায় দেখা গেলেও নিয়মিত চর্চা, গুরুত্বপূর্ণ আড্ডা, পড়াশোনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একেবারেই কম। খুব ভাসা ভাসা হলেও মোটামুটি নিজেদের অবস্থা বুঝে নেয়ার জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। সংবিধানে স্বীকৃত সমান অধিকার সব দেশের নারীদের ভাগ্যে জোটে না। আমাদের এটা বিরল সৌভাগ্য; কিন্তু আমরা এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। ৩৬ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আমরা বহু হিসাব নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করছি। রাজনৈতিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কারের নানা ধারা প্রবর্তিত হচ্ছে। নারী কেন এই সময়ে নিজের হিসাবটা ঠিক করে নেবে না?

১৯১১ সালে লেখা জাপানি এক কবির কবিতার দিয়ে এই প্রতিবেদনের ইতি টানছি। দীর্ঘ প্রায় একশ' বছর আগে লিখিত কবিতা যেন আগামীর নারীর কথা বলছে– লিখেছেন হিরাৎসুকা রাইচো–

'আমি নতুন নারী
আত্ম অন্বেষায়, অনবরত খুঁজে খুঁজে
প্রতিদিন বদলে নিই নিজেকে।
অনবরত লড়ছি, আমার যে নতুন
সত্তায় বিকশিত হতে চাই।
আমিই সূর্য...
আজকের নারী মুগ্ধ হয় না নিজের রূপের বিভায়
সে চাইছে সক্ষমতা, সবলতা। সজোরে চিৎকার
করছে শক্তির জন্য। যে শক্তিতে সে গড়বে তার
স্বপ্নের আগামী, আবাস, পৃথিবী।'

● সাক্ষাৎকার গ্রহণে তাসকিনা ইয়াসমিন

তরুণের চোখে স্বপ্নের বাংলাদেশ

রিক্তা আক্তার

স্বেচ্ছাসেবক, এডিডি বাংলাদেশ

আগের তুলনায় আমরা একটু অধিকার পাচ্ছি। তারপরও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন চলছেই। নারী-পুরুষ দু'জনকে আলাদাভাবে বিচার করা হচ্ছে। একই অন্যায় পুরুষ করলে সবাই খারাপ বলে না; কিন্তু নারী করলে তাকে সবাই দোষ দিচ্ছে। আমাদের পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সবার সুন্দর মন নিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের সার্থকতা আমরা পাবো।

মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন জনি

ছাত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, নর্দান ইউনির্ভাসিটি

আমাদের মুক্তিযুদ্ধটি ছিল সম্মিলিত লড়াই। ধর্ম, বর্ণ, কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই আমরা যুদ্ধ করেছি; কিন্তু এখন নিজেদের মধ্যে কলহ করছি। আমাদের এত কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়েছি। এমনভাবে যদি চলতে থাকে তবে আমাদের এ অর্জনটুকুও হয়তো থাকবে না। যেটুকু আছে তাও হারাবো। এ অর্জনটুকু ধরে রাখতে আমাদের এখন থেকেই কাজ করতে হবে। বদলাতে হবে অনেকের স্বার্থপর মানসিকতা।

সিফাত মুনিয়া

ছাত্রী, ইডেন কলেজ, ফাইনাল ইয়ার

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেটুকু জানি তা বই পড়ে আর গল্প শুনে, যুদ্ধ দেখিনি। এটুকু বুঝি, অনেক আশা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল; তবে এখনো আমাদের সব প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এখন আমাদের দেশ অনেক উন্নত। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরাও অনেক এগিয়েছেন। সব চ্যালেঞ্জিং পেশায় মেয়েরা আসছেন। যদি পাকিস্তান থাকত তাহলে তারা যেভাবে ধর্ম দিয়ে সব করতে চায় তাতে মেয়েদের এ উন্নয়ন সম্ভব হতো না।